আত তাকভীর

৮১

নামকরণ

সূরার প্রথম বাক্যের كُوِّرَتْ শব্দটি থেকে নামকরণ করা হয়েছে। তাকভীর (تكوير) হচ্ছে মূল শব্দ। তা থেকে অতীত কালের কর্তৃবাচ্য অর্থে কূওভিরাত (كورت) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। এই নামকরণের অর্থ হচ্ছে, এটি সেই সূরা যার মধ্যে গুটিয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়, এটি মক্কা মু'আয্‌যমার প্রথম যুগের নাযিল হওয়া সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে দু'টি ঃ আখেরাত ও রিসালাত।

প্রথম ছ'টি আয়াতে কিয়ামতের প্রথম পর্বের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ যখন সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে। তারকারা স্থানচ্যুত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হবে। পাহাড়গুলো পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে উৎপাটিত হয়ে শূন্যে উড়তে থাকবে। মানুষ তাদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসের কথা ভুলে যাবে। বনের পশুরা আতংকিত ও দিশেহারা হয়ে সব এক জায়গায় জড়ো হয়ে যাবে। সমুদ্র স্ফীত হবে ও জ্বলে উঠবে। পরবর্তী সাতটি আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্বের উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ যখন রূহগুলোকে আবার নতুন করে শরীরের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হবে। আমলনামা খুলে দেয়া হবে। অপরাধের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আকাশের সমস্ত পরদা সরে যাবে। এবং জান্নাত–জাহান্নাম ইত্যাদি সব জিনিসই চোখের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আখেরাতের এই ধরনের একটি পুরোপুরি ছবি আঁকার পর একথা বলে মানুষকে চিন্তা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তি কি পাথেয় সংগ্রহ করে এনেছে তা সে নিজেই জানতে পারবে।

এরপর রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের সামনে যা কিছু পেশ করছেন সেগুলো কোন পাগলের প্রলাপ নয়। কোন শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও বিভ্রান্তিও নয়। বরং সেগুলো আল্লাহর প্রেরিত একজন উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন বুযর্গ ও বিশ্বস্ত বাণীবাহকের বিবৃতি, যাঁকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উন্মুক্ত আকাশের দিগন্তে দিনের উজ্জ্বল আলোয় নিজের চোখে দেখেছেন। এই শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমরা কোন্ দিকে চলে যাচ্ছো?

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ۝٩ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝١١ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝١٢ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝١٣ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝١٤

যখন সূর্য গুটিয়ে নেয়া হবে।[১] যখন তারকারা চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।[২] যখন পাহাড়গুলোকে চলমান করা হবে।[৩] যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলোকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দয়া হবে।[৪] যখন বন্য পশুদের চারদিক থেকে এনে একত্র করা হবে।[৫] যখন সমুদ্রগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে।[৬] যখন প্রাণসমূহকে[৭] (দেহের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে।[৮] যখন জীবিত পুঁতে ফেলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?[৯] যখন আমলনামাসমূহ খুলে ধরা হবে। যখন আকাশের পরদা সরিয়ে ফেলা হবে।[১০] যখন জাহান্নামের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং জান্নাতকে নিকটে আনা হবে।[১১] সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে সে কি নিয়ে এসেছে।

১. সূর্যকে আলোহীন করে দেবার জন্য এটা একটা অতুলনীয় উপমা। আরবী ভাষায় তাকভীর মানে হচ্ছে গুটিয়ে নেয়া। মাথায় পাগড়ী বাঁধার জন্য "তাকভীরুল আমামাহ" বলা হয়ে থাকে। কারণ আমামা তথা পাগড়ী লম্বা কাপড়ের হয়ে থাকে এবং মাথার চারদিকে তা জড়িয়ে নিতে হয়। এই সাদৃশ্য ও সম্পর্কের কারণে সূর্য থেকে যে আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে তাকে পাগড়ীর সাথে তুলনা করা

হয়েছে। বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন এই বিছিয়ে থাকা পাগড়ীটি সূর্যের গায়ে জড়িয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ তার আলোক বিচ্ছুরণ বন্ধ হয়ে যাবে।

২. অর্থাৎ যে বাঁধনের কারণে তারা নিজেদের কক্ষপথে ও নিজেদের জায়গায় বাঁধা আছে তা খুলে যাবে এবং সমস্ত গ্রহ–তারকা বিশ্ব–জাহানের চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এ ছাড়াও 'ইনকিদার' শব্দটির মধ্যে 'কুদরাত' এর অর্থও রয়েছে। অর্থাৎ তারা শুধু ছড়িয়েই পড়বে না বরং এই সংগে আলোহীন হয়ে অন্ধকার হয়েও যাবে।

৩. অন্য কথায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণেই পাহাড়ের ওজন ও ভারত্ব আছে এবং তা এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। কাজেই এই শক্তি বিলুপ্ত হবার সাথে সাথেই সমস্ত পাহাড় পর্বত সমূলে উৎপাটিত ও ওজনহীন হয়ে এমনভাবে পৃথিবীর বুকে চলতে থাকবে যেমন মেঘ শূন্যে ভেসে বেড়ায়।

৪. আরবদেরকে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা বুঝাবার জন্য এটি ছিল একটি চমৎকার বর্ণনা পদ্ধতি। আধুনিক কালের বাস ও ট্রাক চলাচলের আগে আরবদের কাছে গর্ভবতী উটনীর চাইতে বেশী মূল্যবান আর কোন সম্পদই ছিল না, যার প্রসবের সময় অতি নিকটে। এ সময় তার হেফাজত ও দেখাশুনার জন্য সবচেয়ে বেশী যত্ন নেয়া হতো। উটনীটি যাতে হারিয়ে না যায়, কেউ তাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে না যায় অথবা কোনভাবে তা নষ্ট না হয়ে যায় এ জন্য খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। এই ধরনের উটনীদের থেকে লোকদের গাফেল হয়ে যাওয়ার মানে এই দাঁড়ায় যে, তখন নিশ্চয়ই এমন কোন কঠিন বিপদ লোকদের ওপর এসে পড়বে যার ফলে তাদের নিজেদের এই সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ সংরক্ষণের কথা তাদের খেয়ালই থাকবে না।

৫. দুনিয়ায় কোন সাধারণ বিপদ দেখা দিলে সব ধরনের পশুদের পালিয়ে এক জায়গায় জড়ো হতে দেখা যায়। সে সময় সাপ দংশন করে না এবং বাঘও আক্রমণ করে না।

৬. এখানে سُجِّرَتْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হচ্ছে তাসজীর (تسجير) এবং তা থেকে অতীতকালে কর্মবাচ্যে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত চুল্লীতে আগুন জ্বালাবার জন্য 'তাসজীর' শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিয়ামতের দিন সমুদ্রে আগুন লেগে যাবে, একথাটা আপাত দৃষ্টে বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু পানির মূল তত্ব ও উপাদান সম্পর্কে ধারণা থাকলে এর মধ্যে কোন কিছুই বিস্ময়কর মনে হবে না। আল্লাহ তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অলৌকিক কার্যক্রমের সাহায্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মতো এমন দু'টি গ্যাসকে একসাথে মিশ্রিত করে রেখেছেন যাদের একটি আগুন জ্বালায় এবং অন্যটি নিজে জ্বলে। এই দু'টি গ্যাসের সংমিশ্রণে পানির মতো এমন একটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন যা আগুন নিভিয়ে দেয়। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার একটি ইংগিতই পানির এই মিশ্রণ পরিবর্তন করে দেবার জন্য যথেষ্ট। তখন তারা পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে তাদের মূল প্রকৃতি অনুযায়ী আগুন জ্বালাবার ও জ্বলার কাজে ব্যাপৃত হবে।

৭. এখান থেকে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শুরু হয়েছে।

৮. অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে মানুষ দুনিয়ায় যেমন দেহ ও আত্মার সাথে অবস্থান করছিল আবার ঠিক সেই অবস্থায়ই তাকে নতুন করে জীবিত করা হবে।

৯. এই আয়াতের বর্ণনাভংগীতে মারাত্মক ধরনের ক্রোধের প্রকাশ দেখা যায়। এর চেয়ে বেশী ক্রোধের কল্পনাও করা যেতে পারে না। যে বাপ মা তাদের মেয়েকে জীবিত পুঁতে ফেলেছে আল্লাহর কাছে তারা এত বেশী ঘৃণিত হবে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে একথা জিজ্ঞেস করা হবে না, তোমরা এই নিষ্পাপ শিশুটিকে হত্যা করেছিলে কোন্ অপরাধে? বরং তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ছোট্ট নিরপরাধ মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাকে কোন অপরাধে মেরে ফেলা হয়েছিল? জবাবে সে নিজের কাহিনী শুনাতে থাকবে। জালেম বাপ মা তার প্রতি কি অত্যাচার করেছে এবং কিভাবে তাকে জীবিত পুঁতে ফেলেছে সে কথা সে সবিস্তারে বর্ণনা করতে থাকবে। এ ছাড়াও এই ছোট্ট আয়াতটিতে দু'টি বড় বড় বিষয়বস্তু সংযোজিত করা হয়েছে। এ জন্য কোন শব্দের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়াই শুধুমাত্র বর্ণনাভংগী থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক, এর মধ্যে আরববাসীদের মনে এই অনুভূতি জাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, জাহেলীয়াত তাদেরকে নৈতিক অবনতির এমন নিম্নতম পর্যায়ে পৌছিয়ে দিয়েছে যার ফলে তারা নিজেদের সন্তানকে নিজ হাতে জীবিত অবস্থায় মাটির মধ্যে প্রোথিত করার কাজ করছে। এরপরও তারা নিজেদের এই জাহেলী কর্মকাণ্ডকে সঠিক মনে করে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এই বিকৃত সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য যে সংস্কার মূলক কর্মসূচী এনেছেন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। দুই, এর মধ্যে আখেরাতের অপরিহার্যতার ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট যুক্তি পেশ করা হয়েছে। যে মেয়েকে জীবিত অবস্থায় মাটির মধ্যে প্রোথিত করা হয়েছে তার প্রতি এ অন্যায়ের বিচার কোথাও হওয়া দরকার এবং যেসব জালেম এই জুলুমের কাজটি করেছে এমন একটি সময় আসা দরকার, যখন তাদের এই নিষ্ঠুরতার জন্য তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যে মেয়েটিকে মাটির মধ্যে পুতে ফেলা হয়েছে তার ফরিয়াদ শুনার মতো তখন তো দুনিয়ায় কেউ ছিল না। জাহেলী সমাজ ব্যবস্থায় এ কাজটিকে সম্পূর্ণ বৈধ করে রাখা হয়েছিল, বাপ–মা এ জন্য একটুও লজ্জিত হতো না। পরিবারেও কেউ তাদের নিন্দা ও তিরস্কার করতো না। সমগ্র সমাজ পরিবেশে একজনও এ জন্য তাদেরকে পাকড়াও করতো না। তাহলে আল্লাহর প্রভুত্ব–কর্তৃত্বের অধীনে এই বিরাট জুলুম ও অন্যায়ের কি কোন বিচার হবে না?

প্রাচীনকালে আরবে মেয়েদের জীবিত কবর দেবার এ নিষ্ঠুর পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এর বিভিন্ন কারণ ছিল। এক, অর্থনৈতিক দুরবস্থা। এই দুরবস্থার দরুন লোকেরা চাইতো খাদ্যের গ্রহণকারীর সংখ্যা কম হোক এবং তাদের লালন পালনের বোঝা যেন বহন করতে না হয়। পরবর্তীকালে অর্থ উপার্জনে সহায়তা করবে এই আশায় ছেলেদের লালন পালন করা হতো। কিন্তু মেয়েদের ছোটবেলায় লালন পালন করে বড় হয়ে গেলে বিয়ে দিয়ে অন্যের ঘরে পাঠিয়ে দিতে হবে, এ কারণে মেরে ফেলে দেয়া হতো। দুই, দেশের আইন শৃংখলার ক্ষেত্রে সাধারণ নিরাপত্তাহীনতার কারণে এটা মনে করে পুত্রসন্তানের প্রতিপালন করা হতো যে, যার যত বেশী ছেলে হবে তার তত বেশী সাহায্যকারী হবে। অন্যদিকে গোত্রীয় সংঘর্ষ ও যুদ্ধের সময় মেয়েদের সংরক্ষণ করতে হতো এবং তারা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কোন কাজেই লাগতো না। তিন, আইন শৃংখলার ক্ষেত্রে সাধারণ দুরবস্থার কারণে শত্রুগোত্ররা পরস্পরের ওপর অতর্কিতে হামলা করার সময় প্রতিপক্ষ শিবিরের যতগুলো মেয়েকে হামলাকারীরা লুটে নিয়ে যেতো, তাদেরকে বাঁদী বানিয়ে

রাখতো অথবা কোথাও বিক্রি করে দিতো। এসব কারণে আরবে কোথাও সন্তান প্রসবকালেই মায়ের সামনেই একটি গর্ত খনন করে রাখা হতো। মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তখনই তাকে গর্তে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দেয়া হতো। আবার কোথাও যদি মা এতে রাজী না হতো বা তার পরিবারের কেউ এতে বাধ সাধতো তাহলে অনিচ্ছাসত্বেও বাপ কিছুদিন তাকে লালন পালন করতো। তারপর একদিন মরুভূমি, পাহাড় বা জংগলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কোথাও তাকে জীবিত কবর দিয়ে দিতো। এই ধরনের রেওয়াজ আরবের বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত ছিল। এ ক্ষেত্রে শিশু কন্যাদের সাথে কেমন নির্দয় ব্যবহার করা হতো তার একটি কাহিনী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক সাহাবী একবার তাঁর কাছে বর্ণনা করেন। সুনানে দারামির প্রথম অধ্যায়ে এ দাহীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার জাহেলী যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমার একটি মেয়ে ছিল। সে আমাকে খুব ভালোবাসতো। তার নাম ধরে ডাকলে সে দৌড়ে আমার কাছে আসতো। একদিন আমি তাকে ডাকলাম। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে হাঁটতে লাগলাম। পথে একটি কূয়া পেলাম। তার হাত ধরে ধাক্কা দিয়ে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিলাম। তার যে শেষ কথাটি আমার কানে ভেসে এসেছিল তা ছিল, হায় আব্বা! হায় আব্বা! একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে ফেললেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন বললেন ঃ ওহে, তুমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শোকার্ত করে দিয়েছো। তিনি বললেন ঃ থাক, তোমরা একে বাধা দিয়ো না। যে বিষয়ে তার কঠিন অনুভূতি জেগেছে সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করতে দাও। তারপর তিনি তাকে বললেন ঃ তোমার ঘটনাটি আবার বর্ণনা করো। সেই ব্যক্তি আবার তা শুনালেন। ঘটনাটি আবার শুনে তিনি এত বেশী কাঁদতে থাকলেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেলো। এরপর তিনি বললেন, জাহেলী যুগে যা কিছু করা হয়েছে আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। এখন নতুন করে জীবন শুরু করো।

একথা মনে করা ভুল হবে যে, আরববাসীরা এই চরম অমানবিক কাজটির কদর্যতার কোন অনুভূতিই রাখতো না। কোন সমাজ যত বেশী বিকৃতই হোক না কেন তা কখনো এই ধরনের জুলুম ও অমানবিক কাজকে একেবারেই অন্যায় মনে করবে না, এমনটি কখনই হতে পারে না। তাই কুরআন মজীদে এই কাজটির কদর্যতা ও দূষণীয় হওয়া সম্পর্কে কোন লম্বা চওড়া ভাষণ দেয়া হয়নি। বরং কতিপয় লোমহর্ষক শব্দের মাধ্যমে কেবল এতটুকু বলেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, এমন এক সময় আসবে যখন জীবিত পুঁতে ফেলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ দোষে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল? আরবের ইতিহাস থেকেও জানা যায়, জাহেলী যুগে অনেক লোকের এই রীতিটির কদর্যতার অনুভূতি ছিল। তাবারানীর বর্ণনা মতে কবি ফারাযদাকের দাদা সা'সা' ইবনে নাজীয়াহ আলমুজাশেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহর রসূল! আমি জাহেলী যুগে কিছু ভালো কাজও করেছি। এরমধ্যে একটি হচ্ছে, আমি তিনশ ষাটটি মেয়েকে জীবিত কবর দেয়া থেকে রক্ষা করেছি। তাদের প্রত্যেকের প্রাণ বাঁচাবার বদলে দু'টি করে উট বিনিময় মূল্য হিসেবে দিয়েছি। আমি কি এর প্রতিদান পাবো? জবাবে তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য পুরস্কার রয়েছে এবং সে পুরস্কার হচ্ছে, আল্লাহ তোমাকে ইসলামের নিয়ামত দান করেছেন।

আসলে এটি ইসলামের একটি বিরাট অবদান। ইসলাম কেবলমাত্র আরবের এই নিষ্ঠুর ও জঘন্য প্রথাটি নির্মূল করেনি বরং এই সংগে মেয়ের জন্ম যে একটি দুর্ঘটনা এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও একে গ্রহণ করে নিতে হয়—এই ধরনের চিন্তা ও ধারণারও চিরতরে অবসান ঘটিয়েছে। বিপরীত পক্ষে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে, মেয়েদের লালন পালন করা, তাদেরকে উত্তম শিক্ষা দীক্ষা দেয়া এবং ঘর সংসারের কাজে পারদর্শী করে গড়ে তোলা অনেক বড় নেকীর কাজ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে মেয়েদের সম্পর্কে মানুষের সাধারণ ধারণা যেভাবে পরিবর্তন করে দেন হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে তা আন্দাজ করা যাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি নীচে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করছি ঃ

مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ –

"এই মেয়েদের জন্মের মাধ্যমে যে ব্যক্তিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়, তারপর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণে পরিণত হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَنَا وَهٰكَذَا وَضَمَّ اَصَابِعَهُ –

"যে ব্যক্তি দু'টি মেয়ের লালনপালন করে, এভাবে তারা বালেগ হয়ে যায়, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে ঠিক এভাবে আসবে। একথা বলে তিনি নিজের আঙুলগুলো একসাথে করে দেখান।" (মুসলিম)

مَنْ عَالَ ثَلٰثَ بَنَاتٍ اَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْاَخَوَاتِ فَاَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتّٰى يُغْنِيَهُنَّ اللّٰهُ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوِ اثْنَتَيْنِ ؟ قَالَ اَوِ اثْنَتَيْنِ حَتّٰى لَوْ قَالُوْا اَوْ وَاحِدَةٍ ؟ لَقَالَ وَاحِدَةٍ –

"যে ব্যক্তি তিন কন্যা বা বোনের লালনপালন করে, তাদেরকে ভালো আদব কায়দা শেখায় এবং তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা তার সাহায্যের মুখাপেক্ষী না থাকে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আর যদি দু'জন হয়। জবাব দেন, দু'জনকে এভাবে লালনপালন করলেও তাই হবে। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যদি লোকেরা সে সময় একজনের লালনপালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো তাহলে তিনি একজনের সম্পর্কেও এই একই জবাব দিতেন।" (শারহুস সুন্নাহ)

مَنْ كَانَتْ لَهُ اُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ –

"যার কন্যা–সন্তান আছে, সে তাকে জীবিত কবর দেয়নি, তাকে দীনহীন ও লাঞ্ছিত করেও রাখেনি এবং পুত্রকে তার ওপর বেশী গুরুত্বও দেয়নি, আল্লাহ তাকে জান্নাতে স্থান দেবেন।" (আবু দাউদ)

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلٰثُ بَنَاتٍ وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ –

"যার তিনটি কন্যা আছে, সেজন্য সে যদি সবর করে এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী তাদেরকে ভালো কাপড় পরায়, তাহলে তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ে পরিণত হবে।" (বুখারীর আদাবুল মুফরাদ ও ইবনে মাজাহ)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ صَحْبَتَهُمَا اِلاَّ اَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ

"যে মুসলমানের দু'টি মেয়ে থাকবে, সে যদি তাদেরকে ভালোভাবে রাখে, তাহলে তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" (ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদ)

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمَ اِلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَعْظَمِ الصَّدَقَةِ اَوْ مِنْ اَعْظَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِبْنَتُكَ الْمَرْدُوْدَةُ اِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ –

"নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরাকাহ ইবনে জা'শূমকে বলেন, আমি কি তোমাকে বলবো সবচেয়ে বড় সাদকাহ (অথবা বলেন, বড় সাদকাগুলোর অন্যতম) কি? সুরাকাহ বলেন, অবশ্যই বলুন হে আলাহর রসূল! তিনি বলেন, তোমার সেই মেয়েটি যে (তালাক পেয়ে অথবা বিধবা হয়ে) তোমার দিকে ফিরে আসে এবং তুমি ছাড়া তার আর কোন উপার্জনকারী থাকে না।" (ইবনে মাজাহ ও বুখারী ফিল আদাবিল মুফরাদ)

এই শিক্ষার ফলে মেয়েদের ব্যাপারে কেবল আরবদেরই নয় দুনিয়ার অন্যান্য যেসব জাতি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সবার দৃষ্টিভংগীই বদলে গেছে।

১০. অর্থাৎ এখন যা কিছু দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে তা সব সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠবে। এখন তো আকাশ কেবল শূন্যই দেখা যায় এবং তার মধ্যে দেখা যায় মেঘ, ধূলিকনা, চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ–তারকা। কিন্তু সেদিন আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব তার নিজস্ব ও আসল রূপে আবরণ মুক্ত হয়ে সবার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে।

১১. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যখন লোকদের মামলার শুনানী চলতে থাকবে, তখন জাহান্নামের উদ্দীপ্ত আগুনও সবাই দেখতে পাবে। জান্নাতও তার সমস্ত নিয়ামত সহকারে সবার সামনে হাযির থাকবে। এভাবে একদিকে অসৎলোকেরা জানতে পারবে তারা কোন্ ধরনের জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছে এবং সৎলোকেরাও জানতে পারবে তারা কোন্ জিনিসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কোন্ ধরনের নিয়ামত লাভ করতে যাচ্ছে।

فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِى قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ
مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْأُفُقِ
الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ
رَجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ
أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾

কাজেই, না,[১২] আমি কসম খাচ্ছি পেছনে ফিরে আসা ও অদৃশ্য হয়ে যাওয়া তারকারাজির এবং রাত্রির, যখন তা বিদায় নিয়েছে এবং প্রভাতের, যখন তা শ্বাস ফেলেছে।[১৩] এটি প্রকৃতপক্ষে একজন সম্মানিত বাণীবাহকের বাণী,[১৪] যিনি বড়ই শক্তিধর,[১৫] আরশের মালিকের কাছে উন্নত মর্যাদার অধিকারী, সেখানে তার হুকুম মেনে চলা হয়,[১৬] তিনি আস্থাভাজন।[১৭] আর (হে মক্কাবাসীরা!) তোমাদের সাথী[১৮] পাগল নয়। সেই বাণীবাহককে দেখেছে উজ্জ্বল দিগন্তে।[১৯] আর সে গায়েবের (এই জ্ঞান লোকদের কাছে পৌঁছানোর) ব্যাপারে কৃপণ নয়।[২০] এটা কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়।[২১] কাজেই তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছো? এটা তো সারা জাহানের অধিবাসীদের জন্য একটা উপদেশ। তোমাদের মধ্য থেকে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে সত্য সরল পথে চলতে চায়।[২২] আর তোমাদের চাইলেই কিছু হয় না, যতক্ষণ না আল্লাহ রব্বুল আলামীন তা চান।[২৩]

১২. অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ঠিক নয় যে, কুরআনে যা কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে এগুলো কোন পাগলের প্রলাপ বা শয়তানের ওয়াস্ওয়াসাহ্ ও কুমন্ত্রণা।

১৩. যে বিষয়ের ওপর এই কসম খাওয়া হয়েছে তা সামনের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধরনের কসমের অর্থ হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্ধকারে কোন স্বপ্ন দেখেননি। বরং যখন তারকারা অস্তমিত হয়েছিল, রাত বিদায় নিয়েছিল এবং প্রভাতের উদয় হয়েছিল তখন উন্মুক্ত আকাশে তিনি আল্লাহর ফেরেশতাকে দেখেছিলেন। কাজেই তিনি যা কিছু বর্ণনা করছেন তা সবই তাঁর নিজের চোখে দেখা। সুস্পষ্ট দিনের আলোয় পূর্ণচেতনা সহকারে তিনি এসব দেখেছেন।

১৪. এখানে সম্মানিত বাণীবাহক (রসূল করীম) বলতে অহী আনার কাজে লিপ্ত ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে। সামনের আয়াতে একথাটি আরো সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

আর কুরআনকে "বাণীবাহকের বাণী" বলার অর্থ এই নয় যে, এটি ঐ সংশ্লিষ্ট ফেরেশতার নিজের কথা। বরং "বাণীবাহকের বাণী" শব্দ দু'টিই একথা প্রকাশ করছে যে, এটি সেই সত্তার বাণী যিনি তাকে বাণীবাহক করে পাঠিয়েছেন। সূরা "আল হাক্কা'র ৪০ আয়াতে এভাবে কুরআনকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী বলা হয়েছে। সেখানেও এর অর্থ এই নয় যে, এটি নবীর (সা) নিজের রচনা। বরং একে "রসূলে করীমের" বাণী বলে একথা সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, আল্লাহর রসূল হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি পেশ করছেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ হিসেবে নয়। উভয় স্থানে বাণীকে ফেরেশতা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বাণী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বাণীবহনকারী ফেরেশতার মুখ থেকে এবং লোকদের সামনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা আল হাক্কার ২২ টীকা দেখুন)

১৫. সূরা আন নাজমের ৪–৫ আয়াতে এই বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُّوحٰى – عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى –

"এ তো একটি ওহী, যা তার ওপর নাযিল করা হয়। প্রবল শক্তির অধিকারী তাকে তা শিখিয়েছেন।" জিব্রীল আলাইহিস সালামের সেই প্রবল ও মহাপরাক্রমশালী শক্তি কি? এটি আসলে "মুতাশাবিহাত"–এর অন্তরভুক্ত। আল্লাহ ছাড়া এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য কারোর জানা নেই। তবে এ থেকে এতটুকু কথা অবশ্যি জানা যায় যে, নিজের অসাধারণ ক্ষমতার দিক দিয়ে তিনি ফেরেশতাদের মধ্যেও বৈশিষ্টের অধিকারী। মুসলিম শরীফে কিতাবুল ঈমানে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ আমি দু'বার জিব্রীলকে তার আসল আকৃতিতে দেখেছি। তাঁর বিশাল সত্তা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমগ্র মহাশূন্য জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ছ'টি ডানা সমন্বিত অবস্থায় দেখেছেন। এ থেকে তাঁর অসাধারণ শক্তির বিষয়টি কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

১৬. অর্থাৎ তিনি ফেরেশতাদের কর্মকর্তা। সমস্ত ফেরেশতা তাঁর হুকুমে কাজ করে।

১৭. অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে তিনি কোন কথা আল্লাহর অহীর সাথে মিশিয়ে দেবেন না। বরং তিনি এমন পর্যায়ের আমানতদার যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু বলা হয় সেগুলো তিনি হুবহু পৌঁছিয়ে দেন।

১৮. সাথী বলতে এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। তাঁকে মক্কাবাসীদের সাথী অভিহিত করে আসলে তাঁকে এ বিষয়ের অনুভূতি দেয়া হয়েছে যে, তিনি তাদের জন্য কোন আগন্তুক বা অপরিচিত লোক নন। বরং তিনি তাদেরই জাতি ও গোত্রভুক্ত। তাদের মধ্যেই সারা জীবন তিনি অবস্থান করেছেন। তাদের শহরের প্রতিটি আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁকে চেনে। তিনি কোন্ ধরনের জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও সচেতন

ব্যক্তি তা তারা ভালোভাবেই জানে। এই ধরনের এক ব্যক্তিকে জেনেবুঝে পাগল বলতে গিয়ে তাদের অবশ্যি কিছুটা লজ্জা অনুভব করা উচিত। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আন নাজ্‌মের ২ ও ৩ টীকা দেখুন)

১৯. সূরা আন নাজ্‌মের ৭ থেকে ৯ পর্যন্ত টীকায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ পর্যবেক্ষণকে আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন্‌ নাজ্‌ম ৭–৮ টীকা)

২০. অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কাছ থেকে কোন কথা গোপন রাখেন না। গায়েব থেকে তাঁর কাছে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, ফেরেশতা, মৃত্যুর পরের জীবন, কিয়ামত, আখেরাত বা জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে যা কিছু সত্য ও নির্ভুল তথ্য আসে তা সবই তিনি একটুও কমবেশী না করে তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন।

২১. অর্থাৎ কোন শয়তান এসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে এসব কথা বলে যায়, তোমাদের এ ধারণা ভুল। শয়তান কেন মানুষকে শিরক, মূর্তিপূজা, কুফরী ও আল্লাহদ্রোহিতা থেকে সরিয়ে আল্লাহপরস্তি ও তাওহীদের শিক্ষা দেবে? কেন সে মানুষের মনে লাগামহীন উটের মতো স্বাধীন জীবন যাপন করার পরিবর্তে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন ও তাঁর সামনে জবাবদিহি করার অনুভূতি জাগাবে? জাহেলী রীতিনীতি, জুলুম, দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির পথে চলতে বাধা দিয়ে কেন সে মানুষকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন যাপন এবং ন্যায়, ইনসাফ, তাকওয়া ও উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করবে? এই ধরনের কাজ করা শয়তানের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আশ্‌ শু'আরা ২১০–২১২ আয়াত ও ১৩০–১৩২ টীকা এবং ২২১–২২৩ আয়াত ও ১৪০–১৪১ টীকা)

২২. অন্য কথায় বলা যায়, এ বাণীটি তো সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য উপদেশ একথা ঠিক কিন্তু এর থেকে ফায়দা একমাত্র সেই ব্যক্তি হাসিল করতে পারে যে নিজে সত্য–সরল পথে চলতে চায়। এ থেকে উপকৃত হবার জন্য মানুষের সত্য–সন্ধানী ও সত্য প্রিয় হওয়া প্রথম শর্ত।

২৩. এ বিষয়বস্তুটি ইতিপূর্বে সূরা মুদ্দাস্‌সিরের ৫৬ আয়াতে এবং সূরা দাহারের ৩০ আয়াতে আলোচিত হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন, আল মুদ্দাস্‌সির ৪১ টীকা দেখুন।